DSC1DT: Introduction to International Relations

Suggested readings:

1. Indian Foreign Service Institute. (1997, 1998) *India's Foreign Policy: An Agenda for the 21st Century* Vols. 1 & 2, New Delhi: Konark Publishers, pp. 3-41; 102-119.

2. Ganguly, S. (ed.) (2009) *India's Foreign Policy: Retrospect and Prospect.* New Delhi: Oxford University Press.

3. Vanaik, A. (1995) *India in a Changing World: Problems, Limits and Successes of Its Foreign Policy.* New Delhi: Orient Longman. pp. 19-41; 63-67; 102-114; 118-124; 132-134.

4. Basu, Rumki (ed)(2012) *International Politics: Concepts theories and Issues*, New Delhi, Sage Publications India Pvt Ltd.

3. India's Foreign Policy

Courtesy:

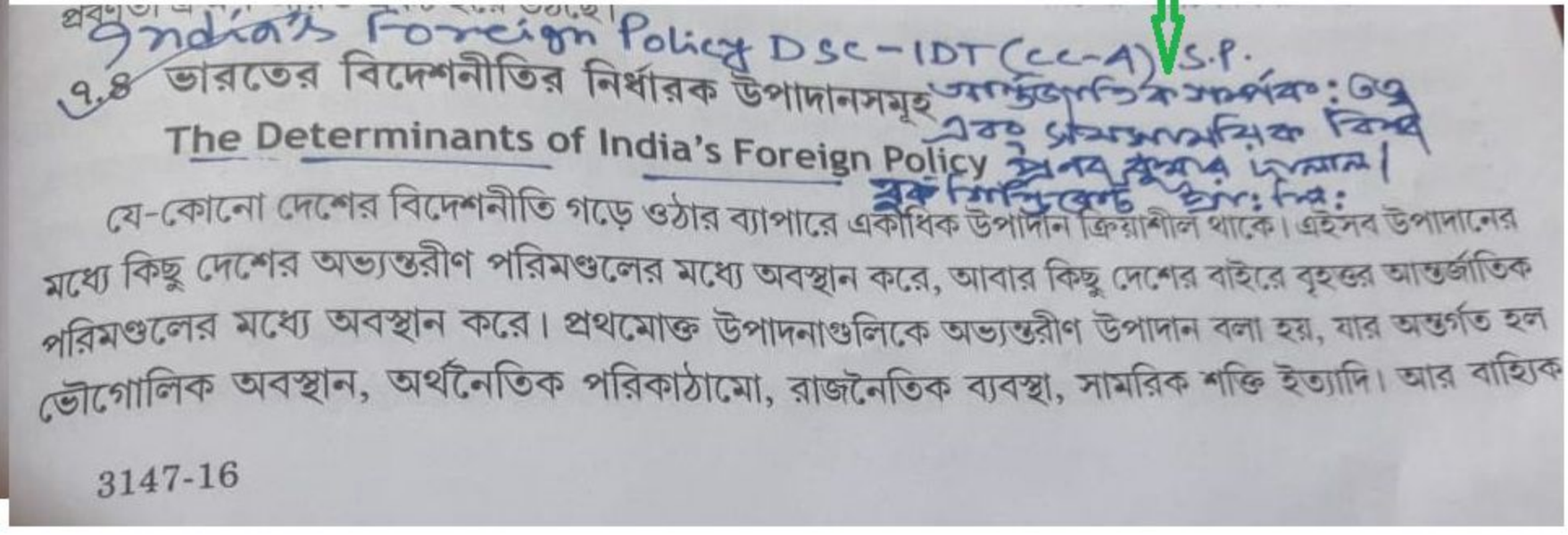

India's Foreign Policy DSC-1DT (CC-A) S.P.

৭.৪ ভারতের বিদেশনীতির নির্ধারক উপাদানসমূহ

The Determinants of India's Foreign Policy

যে-কোনো দেশের বিদেশনীতি গড়ে ওঠার ব্যাপারে একাধিক উপাদান ক্রিয়াশীল থাকে। এইসব উপাদানের মধ্যে কিছু দেশের অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে, আবার কিছু দেশের বাইরে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে। প্রথমোক্ত উপাদনাগুলিকে অভ্যন্তরীণ উপাদান বলা হয়, যার অন্তর্গত হল ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামরিক শক্তি ইত্যাদি। আর বাহ্যিক

3147-16

India's Foreign Policy. DSC-1DT (CC-4) S.P.
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্ব ও তথ্য - অরূপ সেন / প্রকাশক- নবোদয় পাবলিকেশনস্

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল কোনো রাষ্ট্র একক ভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। বিশ্বায়নের যুগে এটি আরও সত্য। কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবি করতে পারে না। বিভিন্ন ভাবে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এই কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখানেই বিদেশনীতি বা পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব অনুভূত হয়। পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করার সময় জাতীয় লক্ষ্য এবং ওই লক্ষ্য কী করে অর্জন করা সম্ভব সে বিষয়ে নজর রাখা দরকার। এই জাতীয় লক্ষ্য ও তৎসহ জাতীয় স্বার্থ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও কার্যকরী করা হয়ে থাকে।

8.1 সংজ্ঞা

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আন্তঃরাষ্ট্র সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ওই সিদ্ধান্তসমূহকে যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় পররাষ্ট্রনীতির দ্বারা। আন্তর্জাতিক সমাজে নিজের বক্তব্য পেশ করার মাধ্যম হল এই পররাষ্ট্রনীতি।

পররাষ্ট্রনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য আছে। এগুলি হল—

(১) দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা,

(২) রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা,

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা

(৪) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

পররাষ্ট্রনীতির ধারণাটি কোনোভাবেই সুস্পষ্ট ধারণা নয়। তা ছাড়া, পররাষ্ট্রনীতির ধারণাটিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এই ধারণাটিকে ব্যাপক এবং সংকীর্ণ—দুটি দিক থেকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞা নীচে বিবৃত করা হল।

(১) **জোসেফ ফ্রাঙ্কেল** (Joseph Frankel) অনেকগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সিদ্ধান্ত বা কার্যকলাপের সমষ্টিকে পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

(২) **চার্লস বার্টন মার্শাল** (Charles Burton Marshall) বলেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতকগুলি কার্যকলাপ সম্পাদন করে বা করতে উদ্যোগী হয়। এদের সমষ্টিকেই পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে গণ্য করা যায়।

(৩) **জি. ও. লার্কে ও এ. এ. সৈয়দ** (G. O. Lerche and A. A. Said)-এর মতে, আন্তর্জাতিক পরিবেশের বিভিন্ন কার্যকলাপকে মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্র যে সকল নীতি নির্ধারণ করে ও তাদের কার্যকর করে তাকেই পররাষ্ট্রনীতি বলা যায়।

(৪) **প্যাডলফোর্ড ও লিনকন** (Padelford and Lincon)-এর মতানুযায়ী, পররাষ্ট্রনীতি হল সেই প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদান যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার স্বার্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করে।

(৫) **এফ. এইচ. হার্টম্যান** (F. H. Hartmann) স্বেচ্ছায় মনোনীত জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত সুসংবদ্ধ বিবৃতিকে পররাষ্ট্রনীতি বলেছেন।

(৬) সি. সি. রোডী (C. C. Rodee) পররাষ্ট্রনীতি বলতে বুঝিয়েছেন সেই সকল নীতির সমষ্টি যার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে এবং অন্য রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়।

Basic Diterminants (Historical, Geo-Political, Economic, Domestic and Strategic)

৪। নির্ধারকসমূহ

পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই নির্ধারকগুলি হল সেই সকল উপাদান যার দ্বারা পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয়ে থাকে। অনেক কিছু বিচার বিবেচনা করার পরই পররাষ্ট্রনীতির প্রণেতাগণ পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অনেকগুলি উপাদানের দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে, পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করার সময় পররাষ্ট্রনীতির প্রণেতাগণকে অনেকগুলি নির্ধারকের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়।

অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় (Jayantanuj Bandyopadhyaya) পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং বাহ্যিক পরিবেশ ও অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিহিত করেছেন।

আবার **জেমস রসনু** (James Rosenau) পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, রাষ্ট্রের আয়তন, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মূল্যবোধ, জনমত, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, নেতৃবৃন্দের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব, সরকারি কাঠামো, রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা, সামাজিক কাঠামো ও প্রতিভা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পররাষ্ট্রনীতির অনেকগুলি নির্ধারক থাকে। তবে এদের মধ্যে থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। এগুলি হল—ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, ইতিহাস, অর্থনৈতিক সম্পদ, মতাদর্শ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি, জাতীয় মূল্যবোধ, জাতীয় স্বার্থ, ঐতিহ্য, জনমত, বিশ্বরাজনৈতিক পরিস্থিতি।

(১) ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ভৌগোলিক অবস্থানকে পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটিকে পররাষ্ট্রনীতির স্থায়ী উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রত্যেকটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি তার ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বহুকাল ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের ঘটনাবলি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত। এটি সম্ভব হয়েছিল তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। অনুরূপভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের যে গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয় তার পিছনেও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব আছে। সাবেকি যুদ্ধের সময় যাতে কোনো রাষ্ট্র অত্যন্ত সহজে নিজের প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারে সে ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের আকৃতির একটি ভূমিকা আছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রিটেনের আকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান তাকে সহজেই অন্যান্য দেশ দ্বারা আক্রমণের সুযোগ দেয়নি। এ ছাড়া, কোনো দেশের সামরিক গুরুত্ব ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সেজন্য কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সেই দেশের জাতীয় প্রতিরক্ষার সহায়ক হওয়া একান্তভাবে কাম্য। তবে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির ফলে দ্রুতগামী বিমান, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, আণবিক মারণাস্ত্রের ব্যবস্থা আরও উন্নতমানের হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস করে ফেলেছে। এই কারণে বলা হয় যে, পররাষ্ট্রনীতির প্রধান নির্ধারক হিসেবে ভৌগোলিক অবস্থানকে বর্তমানকালে আর গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

(২) **জনসংখ্যা** ঃ জনসংখ্যাও পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি নির্ধারক। বহুকাল ধরে কোনো রাষ্ট্রের শক্তি নির্ধারণের ব্যাপারে জনসংখ্যাকে গণ্য করা হত। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, আণবিক অস্ত্রের প্রসার ইত্যাদি জাতীয় শক্তি এবং পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে জনসংখ্যার গুরুত্বকে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এখনও জনসংখ্যার গুরুত্ব আছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, জনসংখ্যার পরিমাণের পাশাপাশি তার গুণগত মানকেও বিবেচনা করা দরকার।

(৩) **ইতিহাস** ঃ প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি তার পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে থাকে। কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলি নির্ধারিত হয় সেই দেশের ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা। পররাষ্ট্রনীতির অনেক মৌলিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে। পররাষ্ট্রনীতি কীভাবে ইতিহাস দ্বারা নির্ধারিত হয় তার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দেশবিভাগের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত আছে। অনুরূপভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূখণ্ডগত বিরোধ সৃষ্টি করেছে।

(৪) **অর্থনৈতিক সম্পদ** ঃ দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাও পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র বিনা বাধায় তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল রাষ্ট্র কিন্তু ততটা সাফল্যের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয় না। কারণ, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হওয়ায় এই দেশগুলিকে অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। ফলে স্বাধীনভাবে এই দেশগুলির পক্ষে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না। এই কারণে দেখা যায় যে, শিল্পোন্নত দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

(৫) **মতাদর্শ** ঃ পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল মতাদর্শ। প্রতিটি রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি এই মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি সেই দেশের মতাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনেকসময় বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে এও ঠিক যে, মতাদর্শগত ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে একটি সহাবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই সহাবস্থানকে কখনোই দীর্ঘকালীন ও চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা সমীচীন নয়।

(৬) **রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি** ঃ দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি নিঃসন্দেহে

পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি ও গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। এটিকে পররাষ্ট্রনীতির শক্তি হিসেবে গণ্য ক যেতে পারে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বুদ্ধিদীপ্ততা, ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা ও গুণগত মানের ওপরই নির্ভ করে পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য। কারণ, তাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র কী ধরনের পররাষ্ট্রনী প্রণয়ন করবে। এই কারণে পররাষ্ট্রনীতিকে কখনোই সরকারি নেতৃত্ব থেকে আলাদা ভাবে দেখা যায় ন

(৭) **জাতীয় মূল্যবোধ** ঃ জাতীয় মূল্যবোধ পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি নির্ধারক। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব কিছু জাতীয় মূল্যবোধ থাকে। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নকালে প্রণয়নকারীরা এই জাতী মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। ফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়।

(৮) **জাতীয় স্বার্থ** ঃ প্রত্যেকটি দেশ কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট থাকে। এগুলিকেই জাতীয় স্বার্থ হিসেবে অভিহিত করা হয়। জাতীয় স্বার্থ কোনো স্থবির ধারণা নয়। এটি সর্ব সর্বদা পরিবর্তনশীল। জাতীয় স্বার্থও পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

(৯) **ঐতিহ্য** ঃ পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে ঐতিহ্য গণ্য হয়ে থাকে। সেই কারণে দেখা যায় যে, কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি সেই দেশের ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারত শান্তির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। এটি ভারতের একটি অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য। সেই কারণে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

(১০) **জনমত** ঃ জনমতের প্রভাবকে উপেক্ষা করে কখনো পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। দেশের জনগণ পররাষ্ট্রনীতির ক্রিয়াকর্ম ও তার ন্যায্যতা ও অন্যায্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা পোষণ করে। যদিও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এও ঠিক যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন পররাষ্ট্রকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের পশ্চাতে জনমতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বলা হয়ে থাকে যে, জনমতের চাপের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

(১১) **বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি** ঃ বিশ্ব রাজনৈতিক অবস্থাকে পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকের বাহ্যিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত করা যেতে পারে। সব দেশের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিমণ্ডলে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হয়। সুতরাং, বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপেক্ষা করে কোনো রাষ্ট্রই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে পারে না।

উপাদানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিদেশি রাষ্ট্রগুলির বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির আচরণ ও প্রতিক্রিয়া, বিশ্বজনমত ইত্যাদি। এই সমস্ত নির্ধারককে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল :

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান : ভারতেরও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে বিদেশি আক্রমণ তথা আগ্রাসন থেকে সুরক্ষিত রেখেছে। একমাত্র ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় চিন হিমালয়ের উচ্চতাকে উপেক্ষা করে ভারতকে আক্রমণ ও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ পর্যন্ত ভারতের ওপর যেসমস্ত বহিরাক্রমণ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি হয়েছে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত থেকে, কারণ ওই অঞ্চলে হিমালয়ের মতো কোনো সুউচ্চ প্রাকৃতিক প্রাচীর নেই। তবে প্রাকৃতিক প্রাচীরের মধ্যেই রয়েছে কিছু গিরিপথ, যে গিরিপথ দিয়ে ভারতকে আক্রমণ করা যেতে পারে এবং তার নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে। ভারতের বিদেশনীতি প্রণয়নের সময় এই বিষয়টিকে মাথায় রাখতে হবে।

ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণে দক্ষিণে অবস্থিত ভারত মহাসাগরের ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। শুধু নিরাপত্তার কারণেই নয়, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূলেও রয়েছে এই ভারত মহাসাগর। কারণ এই ভারত মহাসাগর দিয়েই ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য চলে। তাই ভারত মহাসাগরের ওপর বিদেশি রাষ্ট্রের উপস্থিতি ভারতের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারত চায় এই মহাসাগরীয় অঞ্চলটি শান্তিপূর্ণ এবং শত্রুমুক্ত থাকুক। ভারতের বিদেশনীতিতে এই বিষয়টির গুরুত্ব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যখনই কোনো বিদেশি শক্তি ভারত মহাসাগরের ওপর সামরিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে (উদাহরণস্বরূপ দিয়েগো গার্সিয়া নামক দ্বীপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ, অথবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অনতিদূরে মায়ানমার অধিকৃত কোকো দ্বীপে চিনের নৌবাহিনীর অবস্থান), ভারতের পক্ষে তা যথেষ্ট উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোনো দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সীমান্ত ছাড়াও ভূখণ্ডগত আয়তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়তনের দিক থেকে ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। আয়তনে বড়ো হওয়ার কারণেই হিটলারের জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্বের জন্য তার এই সুবিশাল আয়তন অনেকটাই দায়ী।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন : কোনো রাষ্ট্র আর্থিকভাবে কতখানি উন্নত, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তার বিদেশনীতির গতিপ্রকৃতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে পারলে তবেই সে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে পারে এবং নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে পারে। আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত থাকার কারণেই স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত ভারত তার বিদেশনীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। তাই ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য দেশের আর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করানো। স্বাধীন ভারত প্রথম থেকেই যে শান্তির আদর্শ প্রচার করেছে, এবং জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, তার পিছনে কাজ করেছে দেশের আর্থিক শক্তি বাড়ানোর তাগিদ।

একটি দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি আবার তার প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ সৌদি আরব যেদিন থেকে তার ভূগর্ভস্থ তৈলভাণ্ডারকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে, সেদিন থেকেই সে মধ্যপ্রাচ্যের একটি প্রভাবশালী দেশে পরিণত হয়েছে। আবার শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেই চলবে না, সেই সম্পদকে কাজে লাগানোর মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো চাই। না হলে সেই দেশকে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। বলাবাহুল্য অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল একটি দেশ বৈদেশিক ক্ষেত্রে স্বাধীন নীতি প্রণয়ন বা অনুসরণ করতে পারে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হওয়ার জন্য ভারত একটি যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী দেশ হওয়া সত্ত্বেও উপসাগরীয় যুদ্ধে নিয়োজিত মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলিকে তৈল সরবরাহ করতে ভারত বাধ্য হয়েছিল। তাই স্বাধীন বিদেশনীতি অনুসরণের জন্য অর্থনীতিতে স্বনির্ভর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে গত শতকের শুরু থেকে, যখন থেকে ভারত বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে এবং নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত তার অর্থনীতিকে একটা শক্তপোক্ত

সক্ষম হয়। উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিয়ে ভারত ক্রমশই বিশ্বের দরবারে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে যে, বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় এতবড়ো একটি দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর বেশিদিন ব্রাত্য করে রাখা যাবে না।

(গ) **ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার :** বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনো দেশই তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বা পরম্পরাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। প্রাচীনকাল থেকে ভারত শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদিতে এই শান্তির ললিত বাণীই বারবার উচ্চারিত হয়েছে এবং সেই আদর্শের উত্তরাধিকার বহন করেছেন রাজা রামমোহন রায়, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ আধুনিক ভারতের রূপকারগণ।

শুধু ঐতিহাসিক পরম্পরার জন্যই নয়, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ভারতকে তার বিদেশনীতি প্রণয়নে শান্তি ও মৈত্রীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য করেছে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ভিত্তি করে যথাক্রমে মার্কিন জোট ও সোভিয়েত জোট—এই দুই পরস্পরবিরোধী জোটের মধ্যে অঘোষিত লড়াই, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের পরিস্থিতি, আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার ও প্রতিযোগিতা, অপর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা—এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে থেকে ভারতকে তার জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে বিদেশনীতি প্রণয়ন করতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের কাছে শান্তি ও জোটনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না। এ ছাড়া দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উগ্র জাতীয়তাবাদ ভারতকে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক করে তোলে। শুধু তাই নয়, জাতীয় স্বার্থের কারণেও ভারত এশিয়া, আফ্রিকা সহ বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার অনেক মিল আছে। তাই ওই সমস্ত দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদান বাড়ানোয় ভারত আগ্রহী হয়েছে এবং জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে ৭৭টি রাষ্ট্রের (G77) জোট গঠনে ভারত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

(ঘ) **রাজনৈতিক মতাদর্শ :** ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে রাজনৈতিক মতবাদের বা আদর্শের ভূমিকাও কম নয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র—এ দুটির কোনোটিই এককভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। ধনতন্ত্রের মধ্যে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রাধান্য পায়, সমাজতন্ত্রে তেমনি অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যে মতাদর্শ সেটি হল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, আর ভারত হল প্রকৃতপক্ষে এই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অনুগামী। তাই ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানার সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। আর বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও ভারত কী ধনতান্ত্রিক দেশ কী সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনো দেশকেই ব্রাত্য করে রাখেনি। বরং যেখান থেকে যতটুকু সুবিধা ও সহযোগিতা নেওয়ার ততখানি নিয়েছে। তবে গত শতকের ৯০-এর দশকের পর থেকে ভারত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

(ঙ) **সংসদ (Parliament) :** বিদেশনীতি নির্ধারণে একটি দেশের আইনসভা কতখানি ভূমিকা পালন করবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশটির রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চালু থাকা সত্ত্বেও সে দেশের আইনসভা (কংগ্রেস) বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ভারত ও ব্রিটেনের আইনসভার থেকে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের অনুমোদন ছাড়া শাসন-বিভাগ কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তি, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কার্যকর করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে জার্মানির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ভার্সাই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, তা সিনেটের অনুমোদন না পেয়ে বাতিল হয়ে যায়।

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ে ক্ষমতা যথেষ্ট কম। পররাষ্ট্র বিষয়ে ভারতের পার্লামেন্টের ক্ষমতা আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতীয় পার্লামেন্ট রাষ্ট্রদূত নিয়োগ বা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতা ভোগ করে না। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে যে পরামর্শদান কমিটি রয়েছে, তার ক্ষমতা শুধুমাত্র পরামর্শদানমূলক। কমিটির

সুপারিশ সরকার গ্রহণ করতেও পারে, নাও পারে। তবে পররাষ্ট্র বিষয়ে শুধুমাত্র একটি ব্যাপারে পার্লামেন্ট কিছুটা ক্ষমতা ভোগ করে এবং সেটি হল পররাষ্ট্র নীতি রূপায়ণে আর্থিক বরাদ্দের জন্য শাসনবিভাগকে আইনসভার ওপর নির্ভর করতে হয়।

(চ) ক্যাবিনেট ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রধানত দু-ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়—রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং সংসদ শাসিত। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রচলিত থাকার জন্য শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, বিশেষ করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্রপতি ও তাঁর ক্যাবিনেটের হাতে ন্যস্ত থাকে। অবশ্য মার্কিন সিনেট রাষ্ট্রপতির সন্ধি, চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আবার ভারতের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্লামেন্ট বা সংসদ শাসনবিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাই ভারতে বিদেশনীতি পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানত পররাষ্ট্রমন্ত্রকের ওপর ন্যস্ত থাকলেও সংসদ এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারে, বিতর্কের আয়োজন করতে পারে। তবে সংবিধানগতভাবে সক্ষম হলেও কার্যত ভারতের আইনবিভাগ বা সংসদ সাধারণত সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। ভারতে বিদেশ সংক্রান্ত মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারণ করে ক্যাবিনেট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (Cabinet and the Prime Minister's Office–PMO)। ক্যাবিনেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োগ। ক্যাবিনেটের পররাষ্ট্র দপ্তর এই ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। এই দপ্তরটি একজন বিশিষ্ট ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনে কাজ করে। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের ওপর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ থাকে। বস্তুতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই হলেন ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান স্থপতি। তাঁর বক্তব্যই ভারতের সরকারি ভাষ্য হিসেবে গণ্য হয়। ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধি বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ, ভারত সোভিয়েত চুক্তি, সিমলা চুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নির্দেশ মতো ৭০-এর দশকে পররাষ্ট্র মন্ত্রকে একটি নীতি নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। শ্রীমতী গান্ধির বিশেষ আস্থাভাজন ডি. পি. ধরকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যে সমস্ত সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদিত হয়, সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের যাবতীয় সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদকে জানানো হলেও এ ব্যাপারে সংসদের কোনো কার্যকর ভূমিকা থাকে না। আবার জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় সংসদের কাছে গোপন রাখা হয়। ১৯৭১ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত ছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির। মনে রাখতে হবে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণে যে বিলম্ব ঘটে, একটি স্বৈরাচারী বা একনায়কতান্ত্রিক দেশে বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা ঘটে না, সেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(ছ) রাজনৈতিক পরিস্থিতি : বিদেশনীতি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে শুধু প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র দপ্তর নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধর্মীয় কারণে, জাতিগত কারণে, দলীয় রেষারেষির কারণে, আরও নানা কারণে একটি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতে পারে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে পারে, যা স্থায়ী এবং দৃঢ় পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর, দেবগৌড়া প্রমুখের আমলে ভারতের পক্ষে দৃঢ় বিদেশনীতি প্রণয়ন করা ও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে নরসিংহ রাও, মনমোহন সিং, নরেন্দ্র মোদী প্রমুখের আমলে ভারত তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অনেক দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে।

(জ) সামরিক শক্তি : বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল দেশের সামরিক শক্তি। সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে তার বিদেশনীতি রূপায়ণের কাজটি যত সহজ হয়, একটি দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' নীতির অন্যতম প্রধান শরিক হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬২ সালে চিন ভারতকে আক্রমণ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি। ভারত যদি অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশ হত, তাহলে চিনকে এই ধরনের আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করার আগে অনেকবার ভাবতে হত। এই কারণেই

একটি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে সামরিক খাতে প্রচুর ব্যয় করতে হয়েছে, এমনকি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে হয়েছে। বর্তমানে ভারত শুধু সামরিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও যথেষ্ট শক্তিশালী দেশ। স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে আর আগের মতো বৈদেশিক ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। বর্তমান দিনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই ধরনের আস্থার উদয় হয়েছে যে, ভারত তার নিজের জোরে বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে ভারত শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বের একটি নেতার ভূমিকায় থাকতে রাজি নয়, সে এখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার দাবিতে অটল। বর্তমানে ভারত তার বিদেশনীতি থেকে আদর্শবাদকে ঝেড়ে ফেলে ক্ষমতার রাজনীতির (Power politics) ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে।

(ঝ) বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি : ভারতের বিদেশনীতি প্রণয়ন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে-কোনো দেশের মতো ভারতেরও পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তনের ধারা লক্ষ করলে দেখা যাবে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যে বিদেশনীতি গড়ে তোলা হয়েছে, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে তার পরিবর্তন সাধনও করা হয়েছে। ভারত যখন স্বাধীন হয়, তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন জোট ও সোভিয়েত জোটের মধ্যে ঠান্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দ্বি-মেরুতার উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছে। ভারতের তখন প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখা। এই প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত যে-কোনো প্রকার জোট রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছে, জোটনিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য কোনো জোটের বিরাগভাজন না হয়ে উভয়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য বা ঋণ পাওয়া। তা ছাড়া ভারতের কাছে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ—এ দুটির কোনোটিই এককভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাই তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করলে ভারত তার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করতে সমর্থ হবে।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপর্যয় এবং ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের প্রেক্ষিতে ভারত তার বৈদেশিক নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও বুঝেছিলেন, এক-মেরু বিশ্বে ভারতের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো এবং তার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতির উদারীকরণ। ক্ষমতায় আসার ২ মাসের মধ্যেই রাও সরকার অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে একগুচ্ছ সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকারের এই নয়া উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে মার্কিন সরকার ১৯৯৫ সালে US-India Commercial Alliance গঠন করে এবং ভারতকে বৃহৎ সম্ভাবনাময় বাজার (Big Emerging Market) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ফলত দু-দেশের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হয়।

১৯৯৮ সাল নাগাদ ভারত ও পাকিস্তানের পরমাণু বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি পুনরায় পরিবর্তিত হয়। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটায়। একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক তলানিতে এসে দাঁড়ায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠতে ভারত একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনায় বসে এবং অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। প্রায় একইসঙ্গে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারত তার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করার ব্যাপারে নিরলস এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে, যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতের বিদেশনীতি গঠনের উপাদানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই, বিশেষ করে বাহ্যিক উপাদানটি যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারত কখনও জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে, কখনও তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীন দেশগুলির অন্যতম প্রধান মুখপাত্র হয়ে কাজ করেছে, কখনও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্যায্য নীতি ও কার্যকলাপের নিন্দে করেছে, কখনও বা নীতি বা আদর্শের কথা ভুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছে। একবিংশ শতক থেকে ভারত তার 'পূর্বে তাকাও'